অশোকদাকে প্রনাম করা হয়নি

প্রদীপ দত্ত

১৯৮০ সালের মধ্যেই আমার যা সামান্য লেখাপড়া তা শেষ। চাকরি করতে জাহাজ কিম্বা দূরে কোথাও চলে যেতে হবে। চাকরির কথা শুনলে গায়ে জ্বর আসে। আমার বয়সী যারা চাকরি-বাকরিতে ঢুকেছে তাদের তখন করুণা করি। নতুন করে কিছু সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছি। এইসব অপরিণামদর্শিতার উদাহরন তখন অনেক ছিল। আমার মতো এখনকার সময়ে প্রায় পরিচয়হীনদের অনেকেরই ঐ ছিল পরিচয়।

কিছুদিন ধরে অপূর্বদের (ইষ্ট ক্যালকাটা সোসিওকালচারাল অ্যাসোসিয়েশন) সঙ্গে কাজ করছি। একই ধরনের কাজে যুক্ত মেজদা, খোকনদার সাথে আলাপ হল। যোগিনদা সবে কলকাতায় আবার এসেছেন। বললেন, 'উৎস মানুষ'নামে একটা পত্রিকা বেরোয়, দেখেছো? অশোককে চেনো? শুনলাম কাজের লোকের অভাবে নাকি পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যেতে বসেছে। খোঁজ খবর করে কয়েকটি সংখ্যা জোগাড় করলাম, পড়ে মুগ্ধ হলাম।

এরই মধ্যে রাজনৈতিক কাজে নিজেকে অযোগ্য বলে মেনে নিয়েছিলাম। নানা সামাজিক আন্দোলনের কাজেও মনের তেমন সাড়া নেই। এমন সময় একাশি সালে 'উৎস মানুষ' দেখে মনে হল যেন-এই তো চেয়েছিলাম। ততদিনে আমি কেষ্টপুরের বাসিন্দা। বাস ধরে সল্টলেকে ফুটব্রীজে নেমে চার নম্বর ট্যাঙ্কের কাছে বি ডি ৪৯৪, সল্টলেক। সাদা পা'বি-গে'ি পরা সুদর্শন যুবক অশোক বন্দোপাধ্যায়কে পছন্দ হল। অনেকটাই রাবীন্দ্রিক চেহারা। তখনো পর্যন্ত অমন সুদর্শন, সুভাষিত কোনো বন্ধু-দাদা আমার ছিল না। বাড়ির ছোট, অবিবাহিত ছেলে। কয়েক ঘন্টা কথা হল। তারপর উৎস মানুষ-এর কাজে যাকে বলে ঝাঁপিয়ে পড়লাম।

নিবারণদার হত-দরিদ্র বাইন্ডিংখানা ছিল আমাদের রোজকার বসার জায়গা। সেখানে বউদির সঙ্গে নিবারণদার ঝগড়ায় আমরা সবসময় বউদির পক্ষ নিতাম। অতটুকু ঘরে সাত আট জনের বসার জায়গাই হয়না, তারপর ঐ ঝগড়ার সুবাদে কাজকর্ম লাটে ওঠার জোগার। বেকায়দায় পড়ে অশোকদা তাকে ধমকাতেন। ড. অশোক বন্দোপাধ্যায় আর পবন মুখোধ্যায়ের প্রতি তার আশ্চর্য সমীহ ছিল। নিবারণদা কেমন ঠান্ডা মেরে যেতেন। বাইন্ডিংখানা থেকে রোজ এক সাথেই ফিরতাম। ট্রেনে উল্টোডাঙা স্টেশনে নেমে যে যার বাড়ি। ভাস্করদা কখনো একসাথে, কখনো আলাদা। পবনদা দক্ষিণের ট্রেন ধরতেন। সপ্তাহে একদিন করে থাকতেন দিদিভাই-পূরবী ঘোষ।

রাস্তায় বেড়িয়ে খাই-খাই বাইটা অশোকদাই ধরিয়েছিলেন। তেলেবাজা, স্টেশনের শশা, ঝালমুড়ি যা পাই তাই খাই। অবশ্যই অশোকদার পয়সায়। আমি তখন রোজগারই করিনা। ক্রনিক আমাশার কথাও বলতেন, সেই ভয়ে খাওয়া বন্ধ করতেন না। উৎস মানুষ ততদিনে বেশ সাড়া জাগিয়েছে। নানা জায়গা থেকে ডাক আসতো। অশোকদা যেতেন, আমরাও কেউ কেউ যেতাম। খেতে খেতে যেতাম, গিয়ে খেতাম, খেতে খেতে ফিরতাম। বছর দশেক আগে বাজপেয়ীর আমলে যখন পরীক্ষামুলক পরমানু বিস্ফোরণ ঘটলো, আমরা প্রতিবাদীরা বেশ কিছুদিনের জন্য ১৮নম্বর সূর্য সেন স্ট্রিটে এক কাট্টা হয়েছিলাম। অশোকদাও আসতেন। কয়েকদিন হাতিবাগান হয়ে উল্টোডাঙা পর্যন্ত একসাথে ফিরেছি। হাতিবাগানের দুশ গজ আগে ট্রাম থেকে নেমে আমরা তেলেভাজা খেতাম। এখন মনে হয় এইসব অনিয়ম না করলে অশোকদা হয়তো আরো কয়েক বছর বেশি বাঁচতেন। রাগ এবং আনন্দ দুয়েরই অভিব্যক্তি ছিল একটা প্রচলিত জোরালো গাল। পরে দেখেছি অনেকেরই ভালো না লাগলেও কম বয়সীরা তাতে মুগ্ধ হয়। ভাবে ফিজিক্সের পি এইচ ডি, এত ভালো কাজকর্মের হোতা, কত সহজ ভাবে মেশে! গুরু, একেবারে গুরুদেব! অমন সুন্দর

চেহারা, সুন্দর মুখ, সুললিত কণ্ঠস্বর, সর্বপরি উৎস মানুষ-এর কর্মকান্ডের প্রাণ পুরুষকে অবজ্ঞা করে সাধ্য কার!

১৯৮৩ সালের মধ্যেই উৎস মানুষকে ঘিরে বৃহত্তর কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গের নানা জেলাসহ আসাম, ত্রিপুরাতে তুমুল উৎসাহ দেখা দিল। ততদিনে উৎস মানুষ-এর টিম বড় হয়ে গেছে। পবনদা, ভাস্করদা, শ্যামল দানা, শ্যামল ভদ্র, চিত্ত সামন্ত আর আমি ছাড়াও মধুসূদন দত্ত, স্মরজিৎ জানা, পুরবী ঘোষ -অনেকেই সময় দিচ্ছেন। লাজিদি (অশোকদা নাম দিয়েছিলেন লিজা), রিক্তাদিরা আসার আগেই চলে এসেছেন পারুলদি। তারপর জ্যোতি, গুটু, কিছু পরে তরুন, বরুনদা, বইমেলার সময় শ্যামাদা এবং আরো অনেকে সামিল হয়েছিলেন। এই অবস্থার মধ্যেই মতের মিল না হওয়ায় উৎস মানুষ সঙ্গ একেবারে ছেড়ে দিলাম।

ব্যাপারটা অবশ্য সহজ ছিলনা। দু:খবোধ ছিল তীব্র। ততদিনে উৎস মানুষের বিশেষ বন্যা সংখ্যা, জ্যোতিষ সংখ্যা বেরিয়ে গেছে, বেরিয়েছে কয়েকটি সংকলন। বইমেলার স্টল চালু হয়েছে, কাজে উন্মাদনা তৈরি হয়েছে, নানা ঘটনার সরেজমিন তদন্ত করে প্রতিবেদন প্রকাশ শুরু হয়েছে। নানা জায়গায় উৎস মানুষ পাঠক সভা চালু হয়েছে। সম্পাদক মন্ডলী পত্রিকা চালায়। পশ্চিমবঙ্গে গণবিজ্ঞান আন্দোলনও শুরু হয়েছে। (এই উৎসাহ আর আয়োজন দেখে সিপিআইএম কিছুদিন পরে বিজ্ঞান ম' তৈরি করে। পার্টি রয়েছে বলে বিজ্ঞান ম'ও রয়েছে, অথচ বিজ্ঞান আন্দোলনের যুগ প্রায় শেষ)। আমরা তখন নারী মুক্তি ও কতৃত্ববাদ নিয়েও চর্চা করি, ঝগড়া করি। স্বপ্ন দেখি, আলোচনা করি -গণবিজ্ঞান আন্দোলনের ছাপাখানা খুলবো। প্রথমে চাকরি নেবো ভাস্করদা আর আমি। পরে অশোকদা চাকরি ছাড়বে। কথার কথা নয়, আন্তরিক ভাবেই ভাবতাম। ভাস্করদা তখন উৎস মানুষ থেকে সামান্য মাসোহারা পেতেন। আট জন চাকুরিজীবি চাদা তুলে আমাকে আশি টাকা করে দেন।কথা চলছিলো উৎস মানুষ এবং প্রকাশিতব্য নতুন পত্রিকা অন্বেষার পক্ষ থেকে আমাকে তিনশ করে ছশ টাকা দেওয়া হবে। দুয়েরই হোলটাইমার হবো। চাকরি করতে হরেনা। এই অবস্থায় উৎস মানুষ থেকে দূরে সরে থাকা জটিল মানসিক সংকটের জন্ম দেয়। ততদিনে কেরানির চাকরিতে ঢুকে গেছি। তবে চাকরি ছিলো বাড়তি জ্বালা।

এরমধ্যেই অশোকদা মিত্রাদির বিয়েতে খেয়ে এসেছি। কয়েক বছর পর নানা কাজে একটু ধাতস্থ হলে, উৎস মানুষে পরমানু বিদ্যুৎ ও অন্যন্য প্রসঙ্গে লিখতাম। আগে লিখেছি কখনো কিন্তু বেনামে।মূলত প্রতিবেদন। পশ্চিমবঙ্গের বিজ্ঞান আন্দোলনে তখন উৎস মানুষকে বাদ কিছু করার উপায় ছিল না। ১৯৮৯ সাল থেকে সেফ এনার্জি অ্যান্ড এনভায়র্রনমেন্ট -এর কাজে পুরোপুরি যুক্ত হয়ে অশোকদাদের সাথে যোগাযোগ একেবারে বন্ধ হয়। পাঁচ - ছ বছর ত্রৈমাসিক পত্রিকাটি নিয়মিত চালাতে দম বেরিয়ে যাবার জোগাড়। ১৯৯৫ সালে পত্রিকাটি বন্ধ করে মনের এমন অবস্থা হলো যে কারো সঙ্গেই যোগাযোগ নেই। ১৯৯৮ সালে বিজেপি সরকার পর পর পাঁচটি পরীক্ষামুলক পারমানবিক বিস্ফোরণ ঘটালো। আমি তার খোঁজ রাখিনা। টিভি দেখিনা,খবরের কাগজ পড়িনা। একদিন দুপুরে অশোকদা অফিসে টেলিফোন করলেন। এ নিয়ে উৎস মানুষে লিখতে হবে। যত বলি, বেশ ক'বছর লিখিনি। সব আমি ভুলে গেছি, পারবো না। ভাবেন অভিমান। অভিমান নয় বোঝাতেই যাহোক কিছু লিখতে হলো। তারপর সেই ১৮ সূর্য সেন স্ট্রিটে কিছুদিন নিয়মিত দেখাসাক্ষাতের কথা আগেই বলেছি। পরবর্তী কয়েক বছরে কয়েক বার বাড়ি বদল করে, অনেকের মতো অশোকদার সঙ্গেও আবার যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যায়। শেষ দেখেছিলাম ভাস্করদার বাবা ড. গোবিন্দলাল বন্দোপাধ্যায়ের স্মরণ সভায়।

কিছুদিন আগে পুণ্য জানালো, তোমার এক সময়ের গুরু এখন হাসপাতালে। তার কিছুদিন আগে আমার দাদাও বলেছিলেন, অশোকদার শরীর খারাপ। এরপর ভাস্করদা-রেখা খবর দিলো অশোকদা বি এম বিড়লায় ভর্তি হয়েছেন। 'শরীর খারাপ' কথাটা আগে এতবার শুনেছি অশোকদার ব্যাপারে যে আমার কাছে সে কথার

গুরুত্ব কমেছিলো। কী করে যে ধারণা হয়েছিল অশোকদার ইস্কিমিয়া হয়েছে, মাঝেমাঝে শরীর খারাপ হবে। বি এম বিড়লা নামটা শুনে অসুখের গুরুত্ব বুঝলাম। হাসপাতালে গিয়ে শুনি জ্ঞান নেই। ভেন্টিলেটার চলছে। রোগটার নাম 'কার্ডিও মায়োপ্যাথি'।রোগের বিবরণ শুনে অনুশোচনা হলো, এ কয় বছর এত শারীরিক কষ্টের সময় কাছে গিয়ে হাসি মুখে দাঁড়াতে পারিনি বলে। বি এম বিড়লা থেকে বদলি করা হলো সি এম আর আই-তে। চোখে দেখলাম মৃত্যুর পর। রাত দশটার পর যখন সি এম আর আই-এর মর্গ থেকে মৃতদেহ বার করা হলো। একটু বেশিই তরতাজা লাগলো। বহু টাকা খরচের পর প্রাণ ফিরে না পেলেও এটুকুই হয়তো শান্তনা ছিলো। যেন স্বাস্থ্যবান বীরপুরুষ। অবশ্য যুক্তিতে ক্ষুরধার ও হাসিতে অসামান্য অশোকদার চেহারা তা ছিলো না। অনেকদিন পরে দেখলাম, কিন্তু প্রাণ নেই। ফুলমালা দিয়ে সাজানো হলো। মিত্রাদি আশ্চর্য শান্ত। পাশে ছিল মিস্টি। ওদের মেয়ে।

শববাহী গাড়ি চলতে শুরু করলে ভাস্করদা বললেন, পকাইবাবু নমস্কার করো। হাত জোড় করে মাথায় বুকে ঠেকিয়ে দুজনেই নমস্কার করলাম। পরে মনে হলো মস্ত ভুল হলো। আজকাল তো কত লোককেই পায়ে হাত দিয়ে প্রনাম করি অথচ অশোকদাকে প্রনাম করা হলো না।